The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীগণের মানাকিব: একটি পর্যালোচনা

[The Manaqib of the Companions of Rasulullah (Sm.): An Overview]

Dr. Md. Shafiqul Islam
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 23 July 2024
Received in revised: 27 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
সাহাবীগণ ও মানাকিব

ABSTRACT

The prominent companions of the great Messenger of Allah (S.), are those, who saw him with belief and died upon it. There are lots of discussions about their dignity and honor in the holy Quran and the Hadith. The companions of Rasulullah (Sm.) were the preservers and preachers of the holy Quran and the Hadith. The preservation and preaching of Islam were successful due to their honesty, sincerity and fairness over times. In this respect, neither of them fell in any human weakness nor did they adopt any unfairness. so they were the best in honor after Rasulullah (Sm.) Though they were not innocent like prophets, they were declared forgiven. Nonetheless, some Muslims and non-Muslims scholars criticized them about their sincerity in preaching of the Hadith. However, this essay discusses the acquaintance of the sahabis, Manaqib and about guidelines of Islam in studying Manaquib, along with the Sahabis' Manaquib and its importance in Islamic Sariah.

ভূমিকা

যেসব মহান ব্যক্তি ঈমানসহ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং এ অবস্থায় মুত্যুবরণ করেছেন তাঁরাই 'সাহাবা' হিসেবে পরিচিত। এসব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের জীবন, কর্ম ও তাঁদের প্রশংসনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে 'মানাকিবুস সাহাবী' বা সাহাবীগণের মানাকিব বলা হয়েছে থাকে। আল-কুরআন ও হাদীসে সাহাবীগণের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সংরক্ষক ও সম্প্রচারক। তাঁদের বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে পবিত্র আল-কুরআন ও সুন্নাহ যথাযথ সংরক্ষিত ও সম্প্রচার হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা কেউ কখনো মানবিক দুর্বলতার শিকার হয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। নবিগণের পর সাহাবীগণই মান-মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নবিগণের ন্যায় মা'সূম নন তবে মাগফূর বা ক্ষমা প্রাপ্ত। এতৎসত্ত্বেও কতিপয় মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিত তাঁদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সাহাবীগণের পরিচয়, 'মানাকিব' পরিচিতি, স্বরূপ-প্রকৃতি, এর সংকলন ও বিকাশধারা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবীগণের 'মানাকিব' ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. সাহাবী পরিচিতি

আরবি ভাষায় 'সুহবাহ' (صُحْبَةٌ) শব্দ থেকে 'সাহাবা' (صَحَابَةٌ) বা 'আসহাব' (اصحاب) শব্দটি নির্গত।[১] এটি বহুবচন। একবচনে 'সাহাবী' (صَحَابِىْ) ব্যবহৃত হয়।[২] আভিধানিক অর্থ- সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু, একসাথে জীবন যাপনকারী, আত্মনিবেদিত প্রাণ ইত্যাদি।[৩]

ইসলামী পরিভাষায় 'সাহাবা' দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মুসলিম সঙ্গী বা অনুচরবৃন্দকে বুঝায়। সাহাবীগণের পরিচয় প্রদানে 'আলিমগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

- ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু-৮৫২হি./১৪৪৮ খ্রী.) বলেন,

ان الصحابى من لقى النبى ﷺ مؤمنا به و مات على الاسلام

'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে ঈমান সহকারে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং এ অবস্থায় মৃতুবরণ করেছেন তাঁকে সাহাবী বলা হবে।[৪] এ সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করলে তিনটি বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়।

ক. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ঈমান: যাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দর্শন লাভ করেছে কিন্তু তাঁর ওপর ঈমান আনেনি, এমন কোনো ব্যক্তি সাহাবী হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন-আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কাফির ব্যক্তিবর্গ।

খ. ঈমানের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ: যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্ব বা এ ধরণের কোনো কারণে তাঁকে চোখে দেখতে পারেননি, তাঁরাও সাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন। যেমন- অন্ধ সাহাবী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মি মাকতূম (রা.)।

গ. ঈমানসহ মৃত্যুবরণ: যাঁরা ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছে। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। এ দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। যেমন- আশ'য়াস ইব্ন কাইস (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যান এবং আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে আবার ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫] হাদীস বিশারদগণ তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমুহে সংকলন করেছেন।[৬] তবে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, এরূপ ব্যক্তিকে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তির আলোকে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেননা কুফরী জীবন ছেড়ে রাসূলুল্লাহর (স.) সাক্ষাৎ লাভ ও ইসলাম গ্রহণ অতীত জীবনের সকল পাপ ও অপরাধ বিলীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে ঈমান থেকে কুফরীতে ফিরে গেলে তার ঈমান অবস্থায় যাবতীয় মর্যাদা ও পূণ্যসমূহ বিনষ্টের জন্যও যথেষ্ট। সুতরাং পরবর্তী সময়ে সে ব্যক্তি যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার অতীত পাপসমূহ পুনরায় বিলীন হবে। কিন্তু এ সময়ে রাসূলুল্লাহর (স.) সাক্ষাৎ না পেলে তাকে সাহাবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ মনে করা যায় না।[৭]

- মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল্-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হি.) সাহাবীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,

من صحب النبي ﷺ او راه من المسلمين فهو من اصحابه

'যিনি ঈমানসহ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখেছেন অথবা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন তাঁকে সাহাবী বলা হয়।'[৮]

- প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. (মৃত্যু ৯৪ হি.)-এর মতে, যে ব্যক্তি কমপক্ষে দু'এক বছর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য ও সাহাচর্য লাভ করেছেন অথবা দু'একটি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁকেই কেবল সাহাবী বলা হবে।[৯] তাঁর এ মতের পক্ষে যুক্তি হল আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি ছাড়া এখন কি কোনো সাহাবী বেঁচে আছে? তিনি না সূচক উত্তর দিলেন। কিন্তু সে সময় রাসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখেছেন এমন অনেক ব্যক্তিবর্গ বেঁচে ছিলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাননি।

উপরিল্লিখিত অভিমতটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট বিভিন্ন সময়ে দূরাঞ্চলের ব্যক্তিবর্গ কেবল সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগমন করেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে তাঁর নিকট অনেকে দীর্ঘকাল অবস্থান অথবা কোনো জিহাদে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেননি। যেমন-বাহরাইনের 'আবদুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দল, বনু আসাদ গোত্রের জিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা.), কাইস গোত্রের লাকীত ইবন সাবরা (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অনেকের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন প্রশংসামূলক বাণী প্রদান করেছেন।[১০] সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট দু'এক বছর অবস্থান বা জিহাদে অংশ গ্রহণের শর্তারোপ অসঙ্গত।[১১]

- আহমাদ মুহাম্মদ শাকির বলেন, 'যে ব্যক্তি শৈশবে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখেছেন পরবর্তী সময়ে এ বিষয়টি তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকুক বা না থাকুক তাকে সাহাবী বলা যাবে না। কেননা তারা শরী'আতের আহকাম পালনে দায়িত্বশীল নন। যেমন- ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে শত-শত বার দেখা সত্ত্বেও সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত নন।"[১২] এ সংজ্ঞার সমালোচনা করে কেউ কেউ বলেন, এ সংজ্ঞাটি যথার্থ বলে বিবেচিত নয়। কেননা সাহাবী হওয়ার জন্য যদি বয়ঃপ্রাপ্তকে শর্তভূক্ত করা হয়, তাহলে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.), ইমাম আল-হাসান (রা.), ইমাম আল-হোসাইন (রা.) ও ইবন যুবায়ির (রা.) প্রমুখ সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হবে না। তাই হাফিয আল্-'ইরাকী বলেন, সাহাবী হওয়ার জন্য বয়ঃপ্রাপ্তের শর্তারোপ সমীচীন নয়।[১৩] অতএব কোনো ব্যক্তি যদি শৈশবে রাসূলুল্লাহকে (স.) দেখে থাকেন তবে তাঁর স্মৃতিতে এ বিষয়টি সংরক্ষিত থাক বা না থাক ঈমান অবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন।
- ঐতিহাসিক ইবনুল আসীরের (মৃত্য ৬৩০ হি./ ১২৩০ খ্রী.) মতে কোনো জ্বিন সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত হবে না। কেননা তাদের ইসলাম গ্রহণ, রাসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখা সবই অস্পষ্ট।[১৪] আলোচ্য অভিমতটি পর্যালোচনাপূর্বক বলা যায় যে, জ্বিন সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য সাহাবীর অন্তর্ভুক্তি না হওয়া যথাযথ নয়। কেননা ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী নাসিবীন শহরের জ্বিনদের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট আগমন করে পবিত্র কুরআন শ্রবণ ও বিশ্বাস স্থাপন আল্-কুরআনে বিদ্যমান।[১৫] সুতরাং যে সকল জ্বিন ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখেছেন তারা সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

অতএব উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায়, যাঁরা ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ লাভের পর তাঁর সাহচর্য বেশি বা অল্প দিনের জন্য হউক, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক, এমনকি যে ব্যক্তি জীবনের একটি মুহূর্তের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এমন সকলেই সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।

২. 'মানাকিব' পরিচিতি ও এর স্বরূপ বিশ্লেষণ

'মানাকিব' (مناقب) আরবি শব্দ। এটি 'মানকাব' শব্দের বহুবচন। 'নকব' (نقب) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত।[১৬] এর বেশ কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন- উত্তম ক্রিয়া-কলাপ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দু'টি বাড়ীর মাঝে সঙ্কীর্ণ গলিপথ, পাহাড়ী দুর্গম পথ, অনুসন্ধানী বিজ্ঞজন, পশুর পেটে ছিদ্র করার স্থান, জখম ফাড়ার অস্ত্র প্রভৃতি।[১৭]

'মানাকিব' (مناقب) শব্দের প্রায়োগিক অর্থ উত্তম কর্ম। ব্যক্তি, দল অথবা কোনো বিশেষ স্থানের স্বকীয়তা, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করার জন্য 'মানাকিব' (مناقب) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং জীবন চরিতের যে শাখায় প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তি বা দলের জীবন, কর্ম ও তাঁদের প্রশংসনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবৃত হয় তাকে 'মানাকিব' বলা হয়।[১৮]

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে উত্তম গুণাবলী বর্ণনায় 'মানাকিব' শব্দটি একক পরিভাষা লাভ করে। এজন্য এর সমার্থবোধক ফাদাইল (فضائل), মাফাখীর (مفاخير), 'আখলাক' (اخلاق), তারীফ (تعريف), আখবার (اخبار)-এর ন্যায় শব্দসমূহ অর্থগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানাকিবের ন্যায় বিভিন্ন গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, অধ্যায় ও শিরোনামে স্থান পায়।[১৯] পরবর্তী সময়ে জ্ঞান তাপস মহান ব্যক্তিবর্গের অলৌকিক কার্যক্রম বর্ণনায় 'মানাকিব' শব্দটি পারিভাষিক রূপ লাভ করে। এমনকি বিভিন্ন শ্রদ্ধাভাজন বাক্তির ক্ষেত্রেও 'মানাকিব' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[২০]

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তাকওয়া, আনুগত্য ও সুমহান চরিত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের গুণাবলী ও বিস্ময়কর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে।[২১] তাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসায় তুলনামূলক উপস্থাপন পবিত্র কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২২]

সূরাহ আল-ফাতিহায় নবি-রাসূল ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীদের পবিত্র জীবন পরিক্রমার সুনির্দিষ্ট আলোকিত পথকে মহান আল্লাহ 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩] এ আয়াতটিকে নবি-রাসূল ও তাঁদের সাথীবর্গের প্রশংসাসূচক বর্ণনা মানাকিবের প্রথম দৃষ্টান্ত মনে করা যায়।

অনুরূপভাবে সূরাহ আল-বাকারার প্রথম পর্যায়েই মহান আল্লাহ মুত্তাকী বান্দাদের 'মানাকিব' আলোচনা করেছেন।[২৪] নবি-রাসূলগণের 'মানাকিব' বর্ণনার ধারায় প্রথম নবি আদম (আ.)-এর অতুলনীয় জ্ঞানের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْۚ–فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْۙ–قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِۙ–وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

'মহান আল্লাহ বললেন, হে আদম, এগুলোর নাম তাদেরকে (ফেরেশ্‌তাদের) জানাও। সুতরাং যখন সে এগুলোর নাম তাদেরকে জানাল, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং গোপন কর তাও আমি জানি।'[২৫]

নূহ (আ.)-এর চরম ধৈর্য ও কর্তব্যপরায়ণতার 'মানাকিব' প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর নামে স্বতন্ত্র সূরাহ অবতীর্ণ করেছেন।[২৬] অনুরূপভাবে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইব্রাহীম (আ.)-এর 'মানাকিব' বর্ণিত হয়েছে।[২৭] আত্মনিবেদন ও চরম আত্মত্যাগের মহিমায় তিনি মুসলিম জাতির জনকের মর্যাদা লাভ করেছেন।[২৮] মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসমাঈল (আ.)-এর ঈমান ও আত্মোৎসর্গের 'মানাকিব' পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।[২৯]

মুসা (আ.)-এর কর্তব্যপরায়ণতা ও সাহসিকতার বিবরণ সম্বলিত 'মানাকিব' পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।[৩০] আর আল্লাহর পথে জিহাদ ও তাকওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত দাউদ (আ.)-এর 'মানাকিব' আল-কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে।[৩১] আবার বিশাল প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক সুলাইমান (আ.)-এর 'মানাকিব'ও আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৩২]

ইউসুফ (আ.)-এর নির্মল চরিত্র ও জ্ঞানের মানকিব আল-কুরআনে বিদ্যমান।[৩৩] অনুরূপভাবে আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্য ও দৃঢ় ঈমানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

'আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'[৩৪]

ইউনুস (আ.)-এর আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,[৩৫]

وَ ذَاالنُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

'আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল, এবং মনে করেছিল যে, আমি তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, 'আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম।'

ঈসা (আ.)-এর জন্ম মহান আল্লাহর কুদরতের অন্যতম দৃষ্টান্ত।[৩৬] জন্ম থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত তিনি রিসালাতের দায়িত্বে অবিচল নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৩৭]

সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর মাঝে মহামানবের সকল গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এ জন্য তাঁর 'মানাকিব' আল-কুরআনের প্রতি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। তাঁর বিভিন্নমুখী গুণাবলীর উপসংহারে মহান আল্লাহ বলেন, وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।)[৩৮]

যুগে যুগে আগমনকারী নবি-রাসূলগণের সহচরবর্গের 'মানাকিব' আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ জুড়ে আছে। এ পর্যায়ে হযরত লুকমান, মারইয়াম, আসিয়া, আসহাবে ইন্তাকিয়া, আসহাবে উখদুদ, আসহাবে কাহাফ ও সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (স.)-এর সাহাবীগণের 'মানাকিব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[৩৯]

৩. সাহাবীগণের 'মানাকিব' সংকলন ও বিকাশধারা

রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণের মাঝেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনেক সাহাবী তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য পেয়েছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই সাহাবীগণের একক অথবা সমষ্টিগত সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যুদ্ধ-জিহাদ ও বীরত্ব গাথা আলোচনা ও সংরক্ষণ আরব জাতির বিশেষ ঐতিহ্য হিসেবে বিরোচিত।[৪০] রাসূলুল্লাহর (স.) ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ শরী'আতের নিয়ম-নীতি সংরক্ষণের পাশাপাশি তাঁর সময়ে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বিবরণ সংরক্ষণ করতে থাকেন। পরবর্তীতে এটি 'মাগাযী' নামে পরিভাষা লাভ করে।[৪১] যদিও রাসূলুল্লাহকে (স.) কেন্দ্র করেই এ সকল বিবরণ সংরক্ষিত হয় তথাপি প্রাসঙ্গিক ভাবেই অনেক সাহাবীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এ বিষয়ে স্থান পায়। নিম্নে যুগ বা শতাব্দীভিত্তিক এ বিষয়ে ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করা হলো:

হিজরী প্রথম শতাব্দী: হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলিম উম্মার নিকট রাসূলুল্লাহর (স.) হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সময়ে 'মানাকিব' স্বতন্ত্র পারিভাষিক রূপ পায়নি।[৪২] ফলে সাহাবীগণের 'মানাকিব' হাদীস ও মাগাযীর বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।[৪৩] সাহাবীগণের যুগে 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণকারী সাহাবার বীরত্ব সম্বলিত 'মাগাযী' বর্ণনা করতেন।[৪৪] এ পর্যায়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) ও আনাস (রা.)-সহ অনেক সাহাবী মাগাযীর বিবরণ দিতেন।[৪৫] বিশিষ্ট সাহাবী যুবাইর ইবন আল-আওয়ামের (রা.) পুত্র 'উরওয়া রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীগণের বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে 'মাগাযী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৪৬] উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিকট থেকে এ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিতেন।[৪৭]

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী: হিজরী প্রথম শতকের শেষ প্রান্তে (৯৯হি-১০১ হি) উমার ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইব্ন হাযম (মৃ. ১১৭ হি.)-ও প্রখ্যাত মুহাদ্দীস ইব্ন শিহাব আয-যুহরীকে (মৃ. ১২৪ হি.) হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য সরকারী নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৮]

খলীফার নির্দেশে তিনি 'মাগাযী' সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংকলন করেন।[৪৯] খলীফা এ সময়ে 'উমার ইবন খাত্তাব (রা.)-এর পৌত্র সালিম ইবন 'আব্দুল্লাহকে 'উমার (রা.)-এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা সম্বলিত বিষয়সমূহ লিখে পাঠাতে নির্দেশ দেন।[৫০] সালিম ইবন 'আব্দুল্লাহর সংকলনটিতে উমার (রা.)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্বলিত 'মানাকিব' প্রতিফলিত হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকে আয-যুহরীর দু'জন প্রখ্যাত ছাত্র মূসা ইবন 'উকবা (মৃ. ১৪১ হি.) ও ইবন ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) মাগাযী সংকলন করেন।[৫১] এ দু'টি সংকলনে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' স্থান পায়।[৫২]

এ শতকে ইমাম আবূ হানীফার (মৃ. ১৫০ হি.) সংকলিত 'কিতাবুল আছার', ইমাম মালিকের (মৃ. ১৭৯ হি.) সংকলিত 'আল-মুয়াত্তা' ও ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরীর (মৃ. ১৬১) সংকলিত 'আল-জামি' গ্রন্থসমূহে সাহাবীগণের প্রশংসনীয় কার্যক্রম তথা 'মানাকিব' সন্নিবেশিত হয়। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর (মৃ. ২০৭ হি.) 'মাগাযী' ও ইবন হিশামের (মৃ. ২১৩ হি.) 'সীরাহ' গ্রন্থদ্বয় অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন চরিতের পাশাপাশি সাহাবীগণের 'মানাকিব' উপস্থাপিত হয়।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী: এ শতকে আল-ওয়াকিদীর বিশিষ্ট ছাত্র ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) 'আত তরাকাতুল কুবরা' নামক বার খণ্ডে বিভক্ত বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে সাহাবীগণের জীবনচরিত ও 'মানাকিব' সম্পৃক্ত হয়।

হিজারী তৃতীয় শতকেই 'মানাকিব' শব্দটি পারিভাষিক রূপ পায় এবং ব্যক্তি ও দলের কীর্তিময় জীবনচরিতের শিরোনামে 'মানাকিব' শব্দের ব্যবহার হতে থাকে। বিশেষত বিশিষ্ট সাহাবীগণের মর্যাদা সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনের শিরোনামে 'মানাকিব' শব্দ সংযোজিত হয়।

এ পর্যায়ে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (মৃ. ২৪১ হি.) 'মানাকিবু আলী ইবন আবি তালিব' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৩] এছাড়া তাঁর সংকলিত 'মুসনাদ' গ্রন্থটিকে হাদীসের বিশ্বকোষ বলা যায়।[৫৪] এ সংকলনটিতে হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা নির্ধারণে তিনি সাহাবীগণের মর্যাদার স্তর নির্দেশ করেছেন।[৫৫]

ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) মুসলিম উম্মার সার্বিক পরিচালনায় সাহবীদের অনুসৃত নীতিমালার গুরুত্ব চিহ্নিত করে মাত্র আঠারো বছর বয়সে 'কাযায়া আস-সাহাবা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৫৬] এরপর সাহবীগণের সঠিক পরিচিতির জন্য তাঁর 'আসামিস সাহাবা' ও তাঁদের মর্যাদা বর্ণনার জন্য 'কিতাবুল ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।[৫৭] এতদ্ব্যতীত তিনি 'আস-সহীহ' গ্রন্থে 'কিতাবুল 'মানাকিব' নামক দীর্ঘ পরিচ্ছেদ সংযোজন করেন। এ পরিচ্ছেদের প্রথমে মানাকিবের স্বরূপ ও বনূ আদনান, কাহতান, কুরাইশ এবং রাসূলুল্লাহর (স.) 'মানাকিব' উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাহাবীগণের সার্বিক মর্যাদা (মানাকিব) বর্ণনার সঙ্গে পৃথকভাবে তেতাল্লিশ (৪৩) জন উল্লেখযোগ্য সাহাবীর 'মানাকিব' স্থান পেয়েছে।[৫৮]

ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.) সাহাবীগণের পরিচিতি ও মর্যাদা সম্পর্কে 'কিতাবুল আওলাদিস সাহাবা' ও 'কিতাবুল মুখাদরামীন' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৫৯] তাঁর 'আস-সহীহ' সংকলনে বুখারীর ন্যায় পয়তাল্লিশ (৪৫) জন বিশিষ্ট সাহাবীর পরিচিতি, তাঁদের মর্যাদা, আহলুল বদর, আসহাবুশ শাজারা ও আহলুল বাইতের সামষ্টিক 'মানাকিব' স্থান পেয়েছে। ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) এ অনুচ্ছেদটিকে 'কিতাবুল ফাদাইলুস সাহাবা' নামকরণ করেছেন।[৬০]

ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.) তদীয় 'আল-জামি' সংকলনে বিশিষ্ট সাহাবার 'মানাকিব' সংযোজন করেছেন।[৬১] তিনি রাসূলুল্লাহর (স.) নবুওয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস উপস্থাপন করে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' সংকলন করেছেন। এপর্যায়ে তিনি পৃথকভাবে পঁয়তাল্লিশ (৪৫) জন বিশিষ্ট সাহাবীর পৃথক পৃথক 'মানাকিব' উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও উম্মুহাতুল মু'মিনীনের সামষ্টিক 'মানাকিব' এবং সাহাবীগণের সামষ্টিক 'মানাকিব' সম্পর্কেও তিনি হাদীস উপস্থাপন করেছেন।

ইমাম ইবন মাজাহ আল-কাযভিনী (মৃ. ২৭৩ হি.) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থটিতে বিশিষ্ট সাহাবীগণের মানাকিবের স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ উপস্থাপন করেছেন।[৬২] এ গ্রন্থে বাইশ (২২) জন বিশিষ্ট সাহাবীর 'মানাকিব' সংকলিত হয়েছে। এছাড়া তিনি 'আশারা মুবাশ্শারাহ' ও বদরী সাহাবীগণের পৃথক পৃথক 'মানাকিব' সংকলন করেন।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী: হিজরী চতুর্থ শতকের প্রথম পর্যায়ে সিহাহ-সিত্তার অন্যতম সংকলক ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.) তৎকালীন দামিস্কের অধিবাসীদের আলীর (রা.) প্রতি বিরূপ ধারণার পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'মানাকিবু আলী ইবন আবি তালিব' সংকলন করেন। এতে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সূত্রেই অধিক বর্ণনা স্থান পায়।[৬৩] ইমাম হাকিম নাইশাপুরী (২৮৫-৩৫৮ হি.) এ শতকের খ্যাতিমান মুহাদ্দীস তাঁর সংকলিত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থটি হাদীসের সু-প্রসিদ্ধ সংকলন। এ গ্রন্থটিতে সাহাবীগণের প্রখ্যাত 'মানাকিব' উপস্থাপিত হয়েছে।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী: হিজরী পঞ্চম শতকে বিশিষ্ট সাহাবার 'মানাকিব' গ্রন্থসমূহের মধ্যে কাজী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.) রচিত 'মানাকিবুল আয়িম্মাহ' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থটিতে তিনি সাহাবীগণের মর্যাদা নির্ণয় করেছেন।[৬৪] প্রখ্যাত মুহাদ্দীস ইবন আব্দুল বার (মৃ. ৪৬৩ হি.) সাহাবীগণের পরিচিতি সম্পর্কিত বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ইস্তী'য়াব ফী আসমাইল আসহাব' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে সাহাবীগণের পরিচিতি বর্ণনার সঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' সংযোজিত হয়েছে। বিশুদ্ধতার দৃষ্টিতে এটি মুহাদ্দীসগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত। আবূ নুয়া'ঈম আহমাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-ইসপাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.) 'মা'রিফাতুস-সাহাবা' গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী: এ শতকে বিশিষ্ট সাহাবার বেশ কয়েকটি 'মানাকিব' গ্রন্থ প্রণীত হয়। প্রখ্যাত আলিম ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) এ শতকের বরেণ্য মুহাদ্দীস। তাঁর রচিত 'সিফাতুল-সাফওয়া' গ্রন্থটিতে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' আলোচিত হয়েছে। ইবন শাহরাশুর (মৃ. ৫৮৮ হি.) আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে 'মানাকিব' গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৫] পণ্ডিত আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৫৬৮ হি.) রচিত 'মানাকিবু আলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৬]

হিজরী সপ্তম শতাব্দী: এ শতকের প্রথম পর্যায়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর (মৃ. ৬০৬ হি.) 'জামিউল ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' উপস্থাপন করেন। তাঁর রচিত 'উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা' গ্রন্থটি সাহাবীগণের পরিচিতি ও মানাকিবের অনবদ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এতদ্ব্যতীত এ শতকের অন্যতম পণ্ডিত মুহিবুদ্দীন

আত-তাবারী (মৃ. ৬৯৪ হি.) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবার চরিতাদর্শ সম্পর্কে 'রিয়াদুন নাদিরা ফী মানাকিবি আশারা' এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রা.) প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কিত 'মানাকিবু আয়িশা' নামক দু'টি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৭]

হিজরী অষ্টম শতাব্দী: এ শতকে প্রখ্যাত মুহাদ্দীস ও ঐতিহাসিক হাফিয শামসুদ্দিন আয-যাহবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) 'সীয়ারু আ'লামিন নুবালা ও 'তাজকিরাতুল হুফফায' নামক দু'টি সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থদ্বয়ে বহু সংখ্যক সাহাবীর 'মানাকিব' স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া তিনি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর বিভিন্ন গুণাবলীর প্রশংসা 'আত-তিবইয়ান ফী মানাকিবি উসমান' নামক একটি পৃথক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

হিজরী নবম শতাব্দী: প্রখ্যাত মুহাদ্দীস হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) হিজরী অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বিশ্ববরেণ্য আলিম। তিনি সাহাবীগণের পরিচিতি সম্পর্কিত বিশ্ব নন্দিত, অবিসংবাদিত গ্রন্থ 'আল-ইসাবা ফী তামীযিস-সাহাবা' রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবীগণের পরিচয় বর্ণনার পাশা-পাশি তাঁদের উল্লেখযোগ্য 'মানাকিব'ও বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তী শতাব্দীসমূহ: পরবর্তী শতাব্দীসমূহে বিশিষ্ট সাহাবীগণের 'মানাকিব' সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইবন আব্দুল হাদীর (মৃ. ৯০৭ হি.) 'মাহদুল ইখলাস ফী মানাকিবি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস' (রা.), জালালুদ্দীন সুয়ুতীর (মৃ. ৯১১ হি.) 'মানাকিবু ফাতিমা', মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-ওয়াজ্জী আল-গাম্মাদের (মৃ. ১০৩৩ হি.) 'কিতাবুল আখবার আত-তাইসা ফী মানাকিবি আয়িশা' ও হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-আজমীর (মৃ. ১০৫৫ হি.) 'মানাকিবু আলী ইবন আবী তালিব' (রা.) প্রখ্যাত আলিম আলী ইবন আব্দুল মালিক হিসামুদ্দিন কাযী খানের (মৃ. ৯৭৫ হি.) 'কানযুল উম্মাল' এবং মুহাদ্দীস শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (মৃ. ১১৭৫ হি.) রচিত 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থটি বিশিষ্ট সাহাবীগণের মানাকিবের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দীস মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (মৃ. ১২৫০) 'দারুস সাহাবা ফী মানাকিবিল কারাবাতি মিনাস সাহাবা' নামক সংকলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশ-শাওকানীর এ গ্রন্থটি ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে দামিস্কের দারুল ফিক্‌র ও বৈরুতের দারুল ফিকরিল মা'য়াসির প্রকাশনা সংস্থা থেকে যৌথভাবে প্রকাশ হয়েছে।

৪. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবীগণের 'মানাকিব'

আল-কুরআন ও হাদীসে সাহাবীগণের 'মানাকিব' তথা মর্যাদা ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু গুণাবলী ও মর্যাদা আলোচনা করা হলো।

এক. সাহাবীগণ হলেন ঈমান ও 'আমলের মানদণ্ড

প্রত্যেক বস্তু যাচাইয়ের জন্য মানদণ্ড বা মাপকাঠি থাকে। ঈমান ও 'আমলের বিশুদ্ধতার জন্য তদ্রুপ একটি মাপকাঠি রয়েছে। সেই মাপকাঠি হলো সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও 'আমল। কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলিম পৃথিবীতে আগমন করবে সকলের জন্য এ মানদণ্ডই প্রযোজ্য। ঈমান তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের গৃহীত সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি থেকে যদি কেউ সামান্য পরিমাণও দূরে সরে যায় তাহলে সেই ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ 'এ সকল ব্যক্তি (সাহাবীগণ) যেভাবে ঈমান আনয়ন করেছে তোমরা সেরূপ ঈমান আনয়ন কর।'[৬৮]

মহান আল্লাহ অন্যত্রে আরও বলেন,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِیْ شِقَاقٍ

> "তোমরা (সাহাবীগণ) যেরূপ ঈমান আনয়ন করেছ লোকেরা যদি সেরূপ ঈমান আনয়ন করে তবে তারা নিশ্চয়ই সৎপথ প্রাপ্ত হবে। আর যদি লোকেরা এরূপ ঈমান আনয়ন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলে বিবেচিত হবে।"[৬৯]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে "اٰمَنَ النَّاس" এবং "بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ" দ্বারা অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে।[৭০] এখানে সাহাবীগণের ঈমানকে বিশ্বের মানুষের ঈমানের মানদণ্ড বলে দেখানো হয়েছে। আর এ মানদণ্ড বিবেচিত হওয়ার ব্যাপারে সকল সাহাবীই সমান অংশীদার।

দুই. প্রত্যেক সাহাবী সর্বোচ্চ মানের হিদায়াতপ্রাপ্ত

সাহাবীগণের প্রত্যেকে সর্বোচ্চমানের হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিলেন। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেন, 'তবে মহান আল্লাহ তোমাদের (সাহাবীগণের) অন্তরে ঈমানকে করে দিয়েছেন সুপ্রিয় ও সুশোভিত। আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করে দিয়েছেন ঘৃণিত। আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে তারাই (সাহাবীগণই) হলেন হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।'[৭১]

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় সাহাবীগণকে তাঁদের পরিচ্ছন্ন ঈমানের কারণে কুফর ও ফিসকসহ যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার সনদ প্রদান করা হয়েছে।[৭২] তাঁদের সম্মানে তাঁদেরকে 'রাশিদূন' বা হিদায়াতের পূর্ণ অনুসারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত সাহাবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো পাপ কাজে কখনো অংশগ্রহণ করেননি। তবে তাঁদের অনিচ্ছাকৃত বা ভুল সিদ্ধান্ত জনিত যে সকল ক্রটি বিচ্যুতি হয়েছে এ সকল কাজ বা সিদ্ধান্তের কারণে অপরাধযোগ্য হয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সান্নিধ্য ও অসংখ্য কল্যাণকর কাজের বিনিময়ে তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা করার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং মহান আল্লাহ তাঁদের ক্রটিবিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করেছেন। এটি সাহাবীগণের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত ও করুণা।[৭৩]

তিন. সাহাবীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত

সাহাবীগণের বিশেষ মর্যাদা হলো, তাঁরা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। আয়াতে বলা হয়েছে,

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْہُمْ مَّغْفِرَۃً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا

'তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।'[৭৪]

মুফাসসিরগণের মতে, আয়াতে বর্ণিত مِنْهُم এর مِنْ অব্যয়টি বর্ণনামূলক। সকল সাহাবায়ে কিরামই ছিলেন পরিপূর্ণ মু'মিন, তাঁরা সৎকর্ম করতেন। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁদের সকলকে ক্ষমা ও পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে।[৭৫]

আসহাবে রাসূল (স.) সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরো বক্তব্য হলো তাঁরা 'মাসূম' (নিষ্পাপ) নন তবে 'মাগফূর' বা ক্ষমাপ্রাপ্ত।[৭৬] সাহাবীগণ ছিলেন তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক। যে কোনোভাবে তাঁদের কোনো ভুল ক্রটি হয়ে গেলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ তাওবার মাধ্যমে অপরাধ মুক্ত হয়েছেন। অনেকেই স্বেচ্ছায় নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার করে কঠিন শাস্তি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হাসিমুখে বরণ করেছেন।[৭৭] অনিচ্ছাকৃত ক্রটি-বিচ্যুতির পরও তাওবাহ কবুল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিচলিত হওয়া ও ক্রন্দনরত থাকার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।[৭৮] তাদের এ সমস্ত গুনাহের ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণা আল-কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান, সুতরাং তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ।

চার. সাহাবীগণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত

ইসলামের সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসছে আর যত মানুষ আসবে সকলের মধ্যে নবিগণের পর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীগণই মান-মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাঁদেরকে মানব জাতির কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[৭৯]

'উমার (রা.)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ 'কুনতুম' (كُنْتُمْ) শব্দটি প্রয়োগ করে সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। কেননা 'কুনতুম' (كُنْتُمْ) শব্দটির স্থলে 'আনতুম' (اَنْتُمْ) শব্দ প্রয়োগও যথাযথ ছিল এবং এতে উম্মতের সকল সদস্য অন্তর্ভূক্ত হত। কিন্তু সাহাবীগণকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করে মহান আল্লাহ সর্বযুগের উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮০] আরবি ভাষায় অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করে কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয়। এ দৃষ্টিতে 'কুনতুম' (كُنْتُمْ) শব্দটি সাহাবীগণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৮১]

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীগণের যুগ ও তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষের নৈতিকতা ও ধর্মীয় মর্যাদা কেমন হবে তা স্পষ্ট করে বলেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

'আমার যুগের লোকেরাই উত্তম। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ।'[৮২]

পাঁচ. সাহাবীগণ পারলৌকিক জীবনের মন্দ পরিণাম থেকে নিরাপদ

নবিগণ 'মাসূম' বা নিষ্পাপ। আর সাহাবীগণ 'মাহফূয' বা সংরক্ষিত। এ দু'শ্রেণী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

'কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাঁর নবিকে এবং নবির সাহাবী যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে কোনো প্রকার অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর ও জ্যোতি তাদের সম্মুখ ও ডানদিকে ধাবিত হতে থাকবে।'[৮৩]

আলোচ্য আয়াতে وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ বাক্যটি দ্বারা ঘোষণাকৃত সুসংবাদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম সকলেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।[৮৪]

ছয়. আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভই একমাত্র কাম্য

সাহাবায়ে কিরামের একটি বিশেষ গুণ হলো, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভে সর্বদা মগ্ন থাকা।’ (فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا يَّبْتَغُوْنَ)।[৮৫] এখানে যে গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাহাবায়ে কিরামের মনোজগতের চিত্র। এ চিত্র তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার প্রকৃত চিত্র। কারণ, তাঁদের একমাত্র কামনা হচ্ছে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। এ অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির বাইরে তাঁদের আর কিছুই চাওয়ার ছিল না, তাই তাঁদের সকল চিন্তা এবং সকল চাওয়া পাওয়া এই অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো।

মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হওয়া। সাহাবীগণ ছিলেন এমন একটি ভাগ্যবান জামা‘আত, যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পৃথিবীতে সাহাবা ব্যতীত অন্যান্য মানুষের মধ্যেও হয়ত অনেকে এ সন্তুষ্টি লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ঘোষণাপত্র লাভ করতে পারেননি। অপর পক্ষে একমাত্র সাহাবীগণই আল্লাহর পক্ষ থেকে এহেন সন্তুষ্টি প্রাপ্তির ঘোষণা পেয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সাহাবীগণের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টির ঘোষণা পূর্বক ইরশাদ হচ্ছে,

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

> ‘মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটি এক মহাসাফল্য।’[৮৬]

সাত. চেহারায় আল্লাহভীরুতার চিহ্ন স্পষ্ট

সাহাবীগণের চেহারায় আল্লাহভীরুতার চিহ্ন স্পষ্ট। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ‘তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।’[৮৭] দীর্ঘ দিন যাবৎ সিজদা করার কারণে কোনো কোনো মানুষের কপালে যে দাগ পড়ে এখানে তা বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহভীরুতা, হৃদয়ের বিশালতা, মর্যাদা এবং মহৎ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব যা আল্লাহর সামনে মাথা নত করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কোনো মানুষের চেহারায় ফুটে ওঠে। আল্লাহর এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদ (স.)-এর এসব সঙ্গী সাথী এমন যে, কেউ তাঁদের একবার দেখা মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে, তাঁরা সৃষ্টির সেরা। কারণ তাঁদের চেহারায় আল্লাহভীরুতার চিহ্ন স্পষ্ট।

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, চেহারায় সিজদার চিহ্ন দ্বারা সচ্চরিত্র উদ্দেশ্য। মানসূর (রহ.) একবার প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ (রহ.)-কে বলেন, আমার তো ধারণা ছিল যে, চেহারায় সিজদার চিহ্ন দ্বারা সালাতের চিহ্ন উদ্দেশ্য যা কপালে পড়ে থাকে। তখন মুজাহিদ (রহ.) বলেন, যাদের অন্তর ফিরাউনের চেয়েও শক্ত তাদের কপালেও এরূপ দাগ বা চিহ্ন পড়ে থাকে। বরং এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিনয় ও নম্রতা।[৮৮]

খলীফা উসমান (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরকে সংশোধন করে এবং গোপনে ভালো কাজ করে, মহান আল্লাহ তার চেহারার মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। মোটকথা, অন্তরের দর্পণ হল চেহারা। সুতরাং অন্তরে যা থাকে তা চেহারায় প্রকাশিত হয়।[৮৯] খলীফা ওমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরকে ঠিক ও সংশোধন করে মহান আল্লাহ তার বাহিরকেও সুসজ্জিত করেন।[৯০]

মালিক (রা.) বলেন, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন তখন তথাকার খ্রিস্টানরা তাঁদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে বলে ওঠে, ‘আল্লাহর কসম! এরা তো ঈসা (আ.)-এর সহচর বা হাওয়ারীগণ হতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।’ প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি চরম সত্য।[৯১]

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই উম্মতের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন, তাওরাত কিতাবেও সাহাবীগণের সম্পর্কে এ বিবরণ দেওয়া আছে। আর ইঞ্জিলেও সাহাবীগণের উদাহরণ এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, একটি বীজ বপন করার পর অঙ্কুর বের হলো। তারপর চারা যখন কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে খাড়া হয় তখন চাষির মন খুশিতে ভরে ওঠে।

এখানে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত সেই চারাগাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল ছিল। অর্থাৎ শুরুতে সাহাবীগণ খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে হজ্জে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছে পৌঁছে।

এখানে চাষি শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, ইসলাম নামক বাগানে তিনি যে চারা লাগিয়েছিলেন, সেই চারা বড় শক্তিশালী ও পুষ্ট হয়ে বাগানের শোভা বর্ধন করেছিল। এই শক্তিশালী বৃক্ষরাজি সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউ নয়। তাই এদেরকে দেখে প্রিয়নবি (স.) আনন্দিত হন। অপরদিকে এই শস্য-শ্যামল ও সমৃদ্ধ বাগান দেখে কাফিরদের মনে হিংসা বিদ্বেষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[৯২]

আট. কাফিরদের অন্যায়ের প্রতি কঠোর

সাহাবীগণ কাফিরদের অন্যায়ের ব্যাপারে বড়ই কঠোর। তাই মহান আল্লাহ বলেন, اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ 'তারা (সাহাবীগণ) কাফিরদের প্রতি খুব কঠোর।'[৯৩] মহান আল্লাহ অন্যত্রে আরও বলেন, اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ 'তারা মু'মিনদের ওপর বিনম্র এবং কাফিরদের ওপর কঠোর হবে।'[৯৪]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً 'হে মুমিনগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।'[৯৫]

এখানে কঠোরতা (اَشِدَّآءُ) দ্বারা জিহাদের ময়দানে কাফিরদের মোকাবিলায় মজবুত পাথরের মত অনমনীয় ও আপোষহীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাককালে উসমান (রা.)-কে যখন মক্কার কাফিরেরা বন্দি করে হত্যা করার গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে হাত রেখে প্রতিশোধের জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করলে মহান আল্লাহ এসব সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেন।

তাফসীরু ফী যিলালিল কুরআন গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ- কাফির পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের প্রতি কঠোর হওয়া। তাই দেখা যায়, কুফরির কারণে তাঁরা আপনজনদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। সুতরাং তাদের কঠোরতা ছিল আল্লাহ তা'আলার খাতিরেই।[৯৬]

এ প্রসঙ্গে আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ

> 'যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার।'[৯৭]

উল্লেখ্য এখানে কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সাহাবীগণ কাফিরদের সাথে রূঢ় আচরণ করেন বা তাদের প্রতি দয়া করেন না; বরং এর অর্থ হচ্ছে, যে স্থলে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত অমুসলিমদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক আচরণ করা হয়েছে।

নয়. পরস্পর সহানুভূতিশীল

একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, মহান আল্লাহ সাহাবায়ে কিরামের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ তুলে দিয়ে তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেন। মদীনায় সাহাবীগণের সেই ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই অপরকে ভালোবাসার এমন দৃষ্টান্ত জগতের অন্য কোথাও নেই। দুনিয়ায় সাহাবীগণ ছিলেন মাটির উপর বিচরণকারী জান্নাতী মানুষ। আল্লাহর অসীম রহমত ও রাসূলুল্লাহ (র.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষসহ যাবতীয় কুকর্ম বিদূরিত হয়ে সেখানে পারস্পরিক সম্প্রীতি, কল্যাণকামিতা, উদারতা, ভ্রাতৃত্ববোধের সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন, (সাহাবীগণ হলেন) পরস্পর সহানুভূতিশীল' (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)।[৯৮]

দশ. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীরত

সাহাবায়ে কিরামের একটি বিশেষ গুণ হলো, তাঁরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে তুমি রুকু ও সিজদারত দেখতে পাবে' (تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا)।[৯৯]

ইবাদতের মধ্যে সালাতের স্থান সর্বাগ্রে। মহান আল্লাহ সালাতের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের নির্দেশ প্রদান করেছেন।[১০০] আলোচ্য আয়াতে সাহাবীগণের সালাতের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যে বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, তাঁরা যেন সকল অবস্থায় ও সকল স্থানে ইবাদত বন্দেগিতেই

মত্ত আছে। রুকু ও সিজদা শব্দ দুটো সামগ্রিক ইবাদতের অর্থ প্রকাশ করেছে। আর ইবাদতের অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য ও দাসত্ব। এ শব্দ দুটো দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মনের প্রকৃত অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের গোটা জীবনটাই কেটেছে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্যের মধ্য দিয়ে।[১০১]

এগার. সাহাবীগণ উম্মতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীগণকে ইসলামের নীতি, স্বরূপ ও আদর্শের শিক্ষা দেন, আর সাহাবীগণ শিক্ষা দেন পরবর্তী উম্মতকে। সাহাবায়ে কিরাম শরী'আতের প্রথম সম্বোধিত জামা'আত। তাই শরী'আতের বিধান হল, পরবর্তীকালীন উম্মত যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভে সক্ষম হয়নি তাঁরা সাহাবীগণের এ মুবারক জামা'আত থেকে শিক্ষা নেবে এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করে চলবে।

'ইবরায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার ওফাতের পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা দেখতে পাবে বহু মতবিরোধ। সে মুহূর্তে তোমরা আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশীদার সুন্নাহ্‌কে অনুসরণ করবে এবং এগুলোকে মাড়ির দাঁত দ্বারা শক্তভাবে ধরে রাখবে। আর তোমরা বেঁচে থাকবে বিদ'আতসমূহ থেকে। কেননা বিদ'আত মাত্রই গুমরাহী।[১০২] অতএব উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবীগণ উম্মতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

বার. সাহাবা পদমর্যাদা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত

নবিগণের পর মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেন সাহাবায়ে কিরাম। রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সরাসরি দেখা এবং তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হওয়ার এ 'আমলটিই সাহাবীগণকে অন্যান্য সকল উম্মত থেকে পৃথক ও উচ্চ আসনে সমাসীন করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর যেহেতু তাঁর সাহচর্য লাভের আর কোনো অবকাশ নেই সেহেতু পরবর্তী উম্মতের কারো পক্ষে এ মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়।

তের. সাহাবীগণ ছিলেন বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ

সাহাবীগণের মাধ্যমেই পবিত্র কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.) ও পরবর্তী উম্মাতের মাঝে সেতুবন্ধন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের কারণে তাঁরা সর্বযুগের সর্বোত্তম বিশ্বস্তের অধিকারী হন। তাঁরা ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত প্রতীক। তাঁদের বিশ্বস্ততার কারণেই পবিত্র কুরআন সর্বযুগের মানুষের মাঝে একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ হিসেবে সমাসীন।

সাহাবীগণ পবিত্র কুরআনের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিটি কথা ও কর্ম সংরক্ষণ করেছেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর সাহচর্য ও 'ইলম অর্জনের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। তাঁরা ইতিহাসে আসহাবে সুফ্‌ফাহ্ নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পরেও সাহাবীগণ শরী'আতের একটি মাত্র হুকুম জানার জন্য দূর-দূরান্তে গমন করতেন। অনেক বিশিষ্ট সাহাবীর জীবনাদর্শে এর প্রমাণ বিদ্যমান।[১০৩] সাহাবীগণ কখনো কোনো জাল হাদীস বর্ণনা করেননি। তাঁদের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার সনদে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমত্যের ঘোষণা হলো,

اَلصَّحَابَةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

'সাহাবীগণের সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত।'[১০৪] এতে প্রমাণিত হয় সাহাবীগণ যাবতীয় মিথ্যাচার ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত।

চৌদ্দ. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা ও সম্মান সমগ্র উম্মতের শীর্ষে।[১০৫] তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, সমালোচনা করা অথবা গালি দেয়া জঘন্য অপরাধ। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) এ সম্পর্কে চরম সতর্কবাণী ঘোষণা করে বলেন,

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ اَحَدُكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهِ

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিওনা। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান খয়রাত করে তবে তা তাঁদের এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান খয়রাতের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে না।"[১০৬]

সাহাবীগণের সমালোচনা করলে রাসূলুল্লাহ (স.) কষ্ট পান। এমনকি স্বয়ং মহান আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হন। রাসূলুল্লাহ (স.) এ সম্পর্কে বলেন, 'সাহাবীগণের সমালোচনার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করো না, তাদেরকে যারা ভালোবাসে, আমার মুহব্বতের খাতিরেই

তারা ভালোবাসে, আর যারা তাদের হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, অচিরেই আল্লাহ্ তাকে গ্রেপ্তার করবেন।'[১০৭]

সাহাবীগণের সমালোচনা করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি কাউকে তাঁদের সমালোচনা করতে দেখলে সেখানে নীরব থাকাও অন্যায়। তখন সমালোচনাকারীর সমুচিত জবাব দেয়া আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (স.) স্বয়ং এ জবাবের ভাষা কি হবে তা নিরূপণ করে বলেন,

اِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰه عَلَى شَرِّكُمْ

'যারা আমার সাহাবীগণকে গালি দেয় তাদের দেখলে তোমরা বলবে, তোমাদের দুষ্কর্মের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'[১০৮]

এ সমস্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর অভিসম্পাতে নিপতিত হবে।

অতএব সাহাবীগণ মুসলিম উম্মার পরম শ্রদ্ধাভাজন। এজন্য সাহাবীগণের প্রতি কটুক্তি অথবা সমালোচনার ব্যাপারে অন্তর ও জিহ্বা সংযত রাখা ঈমানী দায়িত্ব। আর সাহাবীগণের পারস্পরিক মতপার্থক্য ও যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস বর্ণনায় সতর্ক থেকে সংযত ও সম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।

উপসংহার

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (স.) অসংখ্য বাণীর আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমত্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল সাহাবী মুসলিম উম্মার পরম শ্রদ্ধাভাজন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহচর্য প্রাপ্তির মর্যাদার সঙ্গে অপর কোনো সম্মান বা মর্যাদা তুলনাযোগ্য নয়। এ ছাড়াও তাঁরা ইসলামের বুনিয়াদ সুদৃঢ়করণ, দীনের সম্প্রচার, কুরআন ও সুন্নাহর নীতিভিত্তিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। মানবতার কল্যাণের জন্য সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী তাঁদের জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। দীনের জন্য অমানবিক নিপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ ছিল তাঁদের জীবনের অমূল্য ভূষণ। সমগ্র পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন বস্তুবাদ, জড়বাদ, অন্যায় ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠে ন্যায়-ইনসাফ, কল্যাণ ও মানবতার বাণীর ঘোষণা বিশ্ব ইতিহাসের মহাবিস্ময়। রাসূলুল্লাহ (স.) ও পরবর্তী যুগের উম্মাতের মধ্যে সাহাবীগণ মধ্যসূত্র। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) বাণীসমূহের যথাযথ ধারণ, সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে তাঁরা বিশ্বস্ততা ও কর্তব্য পরায়ণতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অতএব আমরা বলতে পারি যে, নবীগণের পর সাহাবীগণই মান-মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] ইবন মানযুর মুহাম্মদ ইবন মুকার্‌রাম, *লিসানুল 'আরাব*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুস সাদির, তা. বি.), পৃ. ৫১৯-৫২০; ইব্রাহীম আনিস, *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ্ ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫০৭ ; J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern written Arabic* (NewYork: Spoken Language Services, Inc. 1976), p. 503.

[২] *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫০৭।

[৩] মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল্-আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৭৭; মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *পবিত্র কুরআনের অভিধান*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭২ ।

[৪] ইব্‌ন হাজার আল্ আসকালানী, *আল্-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, ১ম খণ্ড (মিসর: আল্-মাকতাবাতু আল্-তিজারিয়্যাহ্, ১৯৩৯ খ্রি.), পৃ. ১০।

[৫] বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবন আহমদ আল 'আইনী, *'উমদাতুল কারী*, ১৬শ খণ্ড (কয়েটা: মাকতাবাতুর রশীদিয়্যাহ্, ১৪০২ হি.), পৃ. ১৬৯ ; ইব্‌ন হাজার আল্-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৫।

[৬] মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫।

[৭] মুহাঃ আবুল খায়ের, *মহানবীর (স.) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মানাকিব : একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (পিএইচডি থিসিস, অপ্রকাশিত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৪৪।

[৮] মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল্-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, মানাকিব অধ্যায় (দেওবন্দঃ আসাহ্হুল মাতাবি', তাবি.), পৃ. ৫১৫।

[৯] তাকী 'উছমানী, *তাকলিমাতুল ফাতহিল মুলহিম*, ৫ম খণ্ড (করাচীঃ দারুল 'উলূম, ১৪১৫ হি.), পৃ. ৫৮৫৯ ; তাকী উদ্দীন আন্-নদভী, *'ইলমু রিজালিল হাদীস* (লক্ষ্মৌঃ মাকতাবতুল ফেরদৌস, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩৯-৪০।

[১০] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন্ নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড (দেওবন্দঃ আসাহ আল্-মাতাবি', তাবি.), পৃ. ৩৫।

[১১] *ফাতহুল বারী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪।

[১২] আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, *আল্-বা'য়িছুল হাছীস শরহু ইখতিসারি 'উলূমিল হাদীস* (রিয়াদ: মাকতাবাহ দারুস সালাম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৯।

[১৩] জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড (মিসর: দারুল কুতুব আল্-হাদীস, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২১০।

[১৪] *প্রাগুক্ত*।

[১৫] সূরাহ আল্-জ্বিন, ৭২ : ১-৩।

[১৬] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫২১।

[১৭] ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, দার সাদির, তা. বি.), পৃ. ৭৬৭-৭৬৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫২১ ; মহিউদ্দীন আবুল ফায়িয, *তাজুল উরুস*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দার সাদির, তা. বি.), পৃ. ৪৯২; আলাউদ্দীন আল-আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৩১১।

[১৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫২১।

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩০।

[২০] *প্রাগুক্ত*: *Urdu Encyclopaedia of Islam*, Vol-21 (Lahore: The University of the panjab, 1st edition, 1987), p. 634.

[২১] সূরাহ আল-মারইয়াম, ১৯ : ৪১, ৫৪।

[২২] সূরাহ আল-বুরুজ, ৮৫ : ১১।

[২৩] সূরাহ আল-ফাতিহা, ০১ : ৫-৬।

[২৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, ০২ : ৩-৫।

[২৫] *প্রাগুক্ত*, ০২ : ৩৩।

[২৬] সূরাহ নূহ, ৭১ : ০১-২০।

[২৭] সূরাহ আল বাকারাহ, ০২ : ১২৩-১৩২, ১৩০, ২৫৭; সূরাহ আল-আনআম, ০৬ : ৭৭, ১২০; সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৪০-৫০: সূরাহ ইব্রাহীম, ১৪: ৩৭-৪১; সূরাহ আল- আম্বিয়া, ২১ : ৬৮ ইত্যাদি।

[২৮] সূরাহ আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৮।

[২৯] সূরাহ আস্ সাফফাত, ৩৭ : ১০০-১০১।

[৩০] সূরাহ আল-বাকারাহ, ০২ : ৪৯-৭৪; সূরাহ আল-আরাফ, ০৭ : ১০৩-১৫৫, সূরাহ ত্বহা, ২০ :-৯-৯৭।

[৩১] সূরাহ আল-বাকারাহ, ০২ : ২৫১; সূরাহ আস-সোয়াদ, ৩৮ : ২৪।

[৩২] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৭৯।

[৩৩] সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ২২-৫৬।

[৩৪] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৩।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, ২১ : ৮৭।

[৩৬] সূরাহ আলে ইমরান, ০৩ : ৪৭।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, ০৩ : ৫৪; সূরাহ আস-সফ, ৬১ : ১৪।

[৩৮] সূরাহ আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।

[৩৯] সূরাহ আত-তওবা, ০৯ : ১০০।

[৪০] *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৬

[৪১] এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৯।

[৪২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫৩২।

[৪৩] আব্দুর রহিম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭০), পৃ: ৪৩৬।

[৪৪] খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ, *রিজালু হাওলির রাসূল* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরবী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৭১৭।

[৪৫] সুবহ্ সালিহ, *উলূমুল হাদীস ওয়াল মুসতালাহুহু* (বৈরূত: দারুল ইলমি লিল মালায়ীন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩০।

[৪৬] *কাশফুয যুনুন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪৭।

[৪৭] A Guillaume, *The life of Muhammad* (London: Oxford university press); *মহানবীর (স.) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মানাকিব : একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, পৃ. ২০।

[৪৮] শাব্বির আহমাদ ওছমানী, *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খণ্ড (করাচী: মাকতাবাতুল হিজাজ, তা. বি.), পৃ. ৯২।

[৪৯] *প্রাগুক্ত*।

[৫০] *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ২৩১

[৫১] *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা*, পৃ. ১৮৭-২৩২।

[৫২] *প্রাগুক্ত*।

[৫৩] *কাশফুয যুনুন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪৪।

[৫৪] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৫০৭।

[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৯।

[৫৬] এ.কিউ.এম. শামছুল আলম, *হাদীস সংকলনের ইতিকথা* (চট্টগ্রাম: নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

[৫৭] *প্রাগুক্ত*।

[৫৮] *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৯।

[৫৯] *ফতহুল মুলহিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০।

[৬০] *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৩১০।

[৬১] *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১-২২৯।

[৬২] *সুনানু ইবন মাজাহ*, পৃ. ১০-১৫।

[৬৩] *কাশফুয যুনুন*, ২০, পৃ. ১৮৪৪; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫২৪।

[৬৪] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫২৫।

[৬৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫২৪।

[৬৬] *ব্রুকেলম্যান*, এস আই, পৃ. ৬২৩; *মহানবীর (স.) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মানাকিব : একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, পৃ. ২২।

[৬৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৫২৩।

[৬৮] সূরাহ আল্-বাকারাহ, ০২ : ১৩।

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, ০২ : ১৩৭।

[৭০] আবূ জা'ফর আত্-তাবারী, *তাফসীরু তাবারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

[৭১] সূরাহ আল্-হুজুরাত, ৪৯ : ৭-৮।

[৭২] মুফতী মুহাম্মাদ শাফী, *মাকামে সাহাবা* (করাচী: ইদারাতুল মা'আরেফ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫১।

[৭৩] *প্রাগুক্ত*।

[৭৪] সূরাহ আল-ফাত্হ, ৪৮ : ২৯।

[৭৫] *মা'রেফুল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮২।

[৭৬] *মাকামে সাহাবা*, পৃ. ১১১।

[৭৭] *জামি'উত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

[৭৮] *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৫।

[৭৯] সূরাহ আলে ইমরান, ০৩ : ১১০।

[৮০] ইউসূফ কান্দলবী, *হায়াতুস সাহবা*, ১ম খণ্ড (দিল্লী: ইদারা ইশা'য়াতে দীনিয়াহ, ১৯৯২ ডখ্র.), পৃ. ৫৫।

[৮১] মুহাম্মাদ ইরাকুব পুটিয়াবী, *আযমাতে সাহাবা* (বগুড়া: আল্-মাকতাবাতুল হুসাইনিয়া, তাবি.), পৃ. ২; *মহানবির (স.) বিশিষ্ট সাহাবীগণের মানাকিব : একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, পৃ. ৪৬।

[৮২] *জামি'উত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৮ ; *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৫।

[৮৩] সূরাহ আত-তাহরীম, ৬৬ : ৮।

[৮৪] *আযমাতে সাহাবা*, পৃ. ৪ ।

[৮৫] সূরাহ আল-ফাতাহ, ৪৮ : ২৯ ।

[৮৬] সূরাহ আত-তাওবা, ০২ : ১০০।

[৮৭] সূরাহ আল-ফাতাহ, ৪৮ : ২৯ ।

[৮৮] *তাফসীরু ইবন কাছীর*, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮২০-৮২১।

[৮৯] *প্রাগুক্ত*।

[৯০] *প্রাগুক্ত*।

[৯১] *প্রাগুক্ত*।

[৯২] *তাফসীরু ফী যিলালিল কোরআন*, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৫১।

[৯৩] সূরাহ আল-ফাতাহ, ৪৮ : ২৯।

[৯৪] সূরাহ আল-মায়িদা, ০৫ : ৫৪।

[৯৫] সূরাহ আত-তাওবাহ, ০৯ : ১২৩।
[৯৬] *তাফসীরু ফী যিলালিল কোরআন*, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৪৯।
[৯৭] আহমদ ইবন হাম্বল, *আল্-মুসনাদ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ৪৩৮।
[৯৮] সূরাহ আল-ফাতাহ, ৪৮ : ২৯।
[৯৯] *প্রাগুক্ত*।
[১০০] সূরাহ আল-বাকারাহ, ২ : ১৫৩।
[১০১] *তাফসীরু ফী যিলালিল কোরআন*, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৫০।
[১০২] ইবন হাজর, *ফাতহুল বারী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
[১০৩] মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *আত্-তবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব, ১৯৯০ খ্রী.), পৃ. ২৮১।
[১০৪] *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।
[১০৫] *তাকমিলাতুল ফাতহিল মুলহিম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০।
[১০৬] *আস্-সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ, ৩১০; *জামি'উত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫।
[১০৭] *জামি'উত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫।
[১০৮] *প্রাগুক্ত*।